চতুর্থ অধ্যায়

ডিমাছাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল

> ***"Culture is the pattern of learned and shared behaviour and beliefs of a particular social, ethnic or age group. It can also be described as the complex whole of collective human period."*** [১]

অর্থাৎ যে কোনো জাতি বা উপজাতি সমাজের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও প্রাচীন ঐতিহ্য সেই সমাজের সার্বিক আচার, প্রথা, বিশ্বাস, নৃত্য-গীত, ইত্যাদির মধ্যে সংরক্ষিত ও সক্রিয় থাকে। এইসমস্ত সাংস্কৃতিক উপকরণের মধ্যে একটি সমাজের কিংবা জাতির পরিচয় বিধৃত থাকে।

(ক) নৃত্যগীত পরিচয় :

একটি সমাজের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নৃত্যগীত। সামাজিক জীবনে বিভিন্ন উৎসব ও ধর্মাচরণের অঙ্গ হল নাচ-গান। আদিম মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে জীবিকা অর্জনের সংগ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল তাদের সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির কয়েকটি অঙ্গ হল সংগীত, নৃত্য, চিত্রকলা, সাহিত্য, ইত্যাদি। তবে বিভিন্ন পণ্ডিতদের মধ্যে সংস্কৃতির প্রাচীনতম ধারা হল নৃত্য। সমষ্ঠিগত জীবনে আনন্দ উল্লাসের প্রতিফলন ঘটে নৃত্যে। ডিমাছা সমাজজীবনে নৃত্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

> ***"Dance and Music togather form the major parts of those ethnic art forms***

which appearently speak about the socio-cultural frame work of the people."[২]

যে কোনো লোকনৃত্যের মধ্য দিয়ে একটি জাতি বা গোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থা, সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রা, লোকাচার ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় পাওয়া যায়। লোকনৃত্য হল মানুষের জীবনচর্যার অনুকৃতি। ডিমাছা নৃত্যে ও সমাজের সাধারণ মানুষের সহজ সরল বিশ্বাসের দিকটি পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া ডিমাছাদের উৎপাদন ব্যবস্থা, সামাজিক, প্রাকৃতিক ও ধর্মীয় উপাদানগুলোও এই নৃত্যে সম্পৃক্ত রয়েছে।

ডিমাছা লোকনৃত্য সংগীতাশ্রয়ী নয়। বিশেষ করে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্বলিত কিছু কিছু নৃত্য পরম্পরাগতভাবে এই লোকনৃত্যে প্রচলিত। যেমন সূতাকাটা, কাপড়বোনা, জুমচাষ, মাছধরা, নৌকা চালানো ইত্যাদি দৈনন্দিন কাজকর্মে যে ভঙ্গি রয়েছে ডিমাছা লোকনৃত্যে এইসব বিষয় বাদ্যের তালে তালে নৃত্যের শৈলীতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ডিমাছা সমাজে নৃত্য শুধু আনন্দ উৎসবের মাধ্যম নয়, কখনো তা হয়ে উঠেছে জীবনসংগ্রামের পরিচায়ক। কখনো কর্মক্লান্ত জীবনচর্যার শৈল্পিক বহিঃপ্রকাশ, আবার কখনো তা কর্মদ্যোগী হওয়ার বীজমন্ত্র। শুধু তাই নয়, ধর্মকেন্দ্রিক বিভিন্ন লৌকিক আচার, বিশ্বাসের এক অন্যতম মাধ্যম হল নৃত্য। ডিমাছা ঐতিহ্যগত নৃত্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শৈলীর পরিচয় দেওয়া যাক—

(ক) রিসিংবানী (কাপড়বোনা সংক্রান্ত) : এই নৃত্যশৈলী কেবল আনন্দ উল্লাসের এক মাধ্যম নয়। 'রিসিংবানী' অর্থ হল— 'রি'— কাপড়, 'সিংবানি' অর্থাৎ বুনন। তাঁতে কাপড়বোনা ডিমাছা সমাজের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিল্পচর্চা। অধিকাংশ ডিমাছা মহিলা এই শিল্পচর্চা

করেন।

'রিসিংবানী' নৃত্যশৈলীতে পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে অংশ নিতে পারেন। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক ডিমাছা নৃত্যই দলগতভাবে পরিবেশন করা হয়। 'রিসিংবানী' নৃত্যও দলগতভাবে পরিবেশন করা হয়।

'রিসিংবানী' নৃত্যশৈলী হল হাতে কলমে তাঁকে কাপড়বোনার পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশনা। যুবক-যুবতী একত্রে সারিবদ্ধভাবে ঐতিহ্যগত রঙিন কাপড়ে সুসজ্জিত হয়ে খ্রাম-মড়ির তালে তালে নৃত্যের মধ্য দিয়ে আনন্দে মেতে ওঠে। এই নৃত্যের মধ্য দিয়ে ডিমাছাদের শিল্পকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার ছবি প্রতিফলিত হয়।

(খ) মগংখুবানী (মাংস পরিবেশন শৈলী) : এই নৃত্যশৈলী তেমন কোন ভাবগম্ভীর বৈশিষ্ট্য বহন করে না। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে আনন্দঘন মুহূর্ত, সমবেতভাবে আনন্দ উল্লাস, ভোজ ইত্যাদির বিষয়গুলিই এই নৃত্যশৈলীর মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে বিশ্বাসী ডিমাছা সমাজে গণউৎসবের মাহাত্ম্য সর্বাধিক। তাই তাদের নৃত্যশৈলীতেও উঠে এসেছে এইসব বিষয়।

এই নৃত্য পুরুষ মহিলা দলবদ্ধভাবে মুখোমুখি হয়ে পদসঞ্চালনা করেন। খ্রাম-মুরির তালে তালে তাদের অঙ্গভঙ্গি উৎসবে মাংস পরিবেশনের পদ্ধতিকে চিহ্নায়িত করে। এই নৃত্য পরিবেশনের জন্য বিশেষ কোনো উৎসবের প্রয়োজন হয় না।

(গ) জাওফিনবানী বা রুংজাওবানী (নৌকা বাওয়া শৈলী) : নদী, নৌকা, ইত্যাদি বিষয় ডিমাছাদের ইতিহাস, সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ফলে নৌচালনার বিষয়টিও নৃত্যশৈলীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এই নৃত্যশৈলী ডিমাছা সমাজে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বহুলপ্রচলিত। পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই এই নাচে অংশ নেয়। এই নাচের সময় নর্তক-নর্তকীদের মুদ্রা ক্রমে ক্রমে বাঁশির সুরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হতে থাকে। এই শৈলী নৃত্য খুব অল্পসময়ের জন্য পরিবেশন করা হয়। পুরুষ মহিলা বৃত্তাকারে ঢোল-বাঁশির তালে তালে পদসঞ্চালনা ও হাততালি দেন।

(ঘ) বাইসেরগী (সূতাকাটা শৈলী) : এই নৃত্যশৈলী ডিমাছা সমাজের হস্তশিল্পের বিভিন্ন দিককে উপস্থাপিত করে। কোনো বিশেষ উৎসবে এই নৃত্য পরিবেশিত হয়। ডিমাছা সমাজে তাঁতশিল্পের গুরত্ব অপরিসীম। তাঁতশিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় এই নাচের মধ্যে ফুটে উঠেছে।

(ঙ) বাইডিমা (উৎসবকেন্দ্রিক ডিমাছা নৃত্য) : ডিমাছা সাংস্কৃতিক জগতের এক জনপ্রিয় নাচ এই বাইডিমা। ডিমাছাদের একটি বিশেষ ঋতুকেন্দ্রিক উৎসব হল বুসু। বুসু উৎসবকে কেন্দ্র করে যে-সব আচার, সংস্কার রয়েছে এসবের মধ্যে অন্যতম হল এই বাইডিমা।

(চ) ডাঁইস্লাইবানী (ক্রুশাকারে নৃত্য) : আনন্দপূর্ণ উৎসবে এই নৃত্য পরিবেশিত হয়। অংশগ্রহণকারীরা পরস্পর ক্রুশাকারে মুখোমুখি হয়ে নৃত্য করেন। একটি বড় দল ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়। প্রত্যেকটা দলে চারজন করে থাকবে। যেখানে দুই দল পুরুষ এবং দুটি দল মহিলা। এই নৃত্যশৈলী দলবদ্ধভাবে পরিবেশিত হলেও মূলত দ্বৈত নৃত্য।

(ছ) লামাহেমবানী (পথচলার শৈলী) : ঋতুভিত্তিক উৎসবের বাইডিমা নৃত্যের এক অন্যতম পর্যায় হল এই নৃত্য। বুসু উৎসবের মুখ্য

নৃত্যশৈলীতে যে অঙ্গভঙ্গি, পদসঞ্চালনা দেখা যায়, এই নৃত্য তার অনুরূপ।

(জ) নাসাগিবরিমবানী (মাছ শিকার শৈলী) : এই নৃত্যে রয়েছে পার্বত্য জীবনধারায় লালিত ডিমাছা সমাজের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল শিকার। পরিবেশগত কারণে, একসময় শহুরে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায়, জীবিকার্জনের জন্য ডিমাছারা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল প্রকৃতির ওপর। তাই তাদের খাদ্যান্বেষণ, জীবিকা ইত্যাদি বিষয় নাচের মধ্য দিয়ে চিত্রিত হয়েছে। নাসাগিবরিমবানী অর্থাৎ মাছ শিকার। দলবদ্ধভাবে নদীতে ছোট-মাছ শিকারের পদ্ধতি এই নৃত্যের মধ্য দিয়ে নির্দেশিত হয়েছে।

(ঝ) বাইজ্‌বা (যুদ্ধের নাচ) : নৃত্যের মধ্যে একটি জাতির, সামাজিক প্রতিচ্ছবিও ধরা পড়ে। 'বাইজ্‌বা' অর্থাৎ যুদ্ধের নাচ। (বাই = নৃত্য, জ্‌বা = যুদ্ধ) এই নৃত্যশৈলী যুদ্ধে গমনোদ্যত ডিমাছা পুরুষের বলিষ্ঠ রূপকে নির্দেশিত করে। এই নৃত্যের একটি উপাদান হল তরবারি। ঢোল ও বাঁশির তালে তালে তরবারি হাতে নৃত্যরত পুরুষেরা যুদ্ধক্ষেত্রে ডিমাছা যোদ্ধাদের নিদারুণ মানসিক অবস্থানকে প্রতিবিম্বিত করে। এই নৃত্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, নৃত্যে ব্যবহৃত বাদ্য 'ঢোল' বাজানো হয় কাঠি দিয়ে যেখানে অন্যক্ষেত্রে ঢোল বাজানো হয় আঙুল দিয়ে। এই নৃত্য পরিবেশনের সময় নর্তক এবং দর্শক উভয়ের মনে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করে।

(ঞ) ডাউঠু মাইখনবানী (ঘুঘু পাখির আচরণ বা অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক নাচ) ঃ- এই লোকনৃত্য কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত। ডিমাছা পার্বত্য জীবনের একমাত্র কৃষিপদ্ধতি হল জুমচাষ। উঁচু, নীচু, অসম জমিকে চাষের

উপযুক্ত এবং উর্বর করা সত্যিই এক কষ্টসাপেক্ষ কাজ। কিন্তু অরণ্য জীবনে অভ্যস্থ ডিমাছারা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে আনন্দ সহযোগে এই কাজে নিয়োজিত হয়। কর্মক্লান্ত ব্যস্ত জীবনচিত্র ব্যাপারটিই ব্যক্ত হয় এই নৃত্যশৈলীতে। জুমের ক্ষেতে পাখি যে-ভাবে শস্যের দানা ঠোক্‌রায়, ঠিক সেই ভঙ্গি নাচের তালে তালে যুবক-যুবতীরা নৃত্যের আমেজে মেতে ওঠে।

(ন) হমিজিং লডাইবানী (অরণ্য জীবনকেন্দ্রিক পুরুষদের নৃত্যশৈলী) : এই নৃত্যশৈলী পুরুষকেন্দ্রিক। গভীর জঙ্গলে বন্যপশুদের আচার-আচরণের বিভিন্ন দিক অঙ্কিত হয় এই নৃত্যের মধ্য দিয়ে। দলগতভাবে দুটি সারিতে বিভক্ত হয়ে খ্রাম (ঢোল) ও মুড়ির (বাঁশি) তালে যখন পদসঞ্চালনা করে তাতে বন্যপশু সম্বন্ধে তাদের সাধারণ জ্ঞান, শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে।

ডিমাছা লোকনৃত্য নারী-পুরুষের সমবেত অংশগ্রহণে বর্ণময় হয়ে ওঠে। রঙিন ঐতিহ্যবাহী পোশাকে, খ্রাম (ঢোল), মুড়ি (বাঁশি), মড়ি ওয়াঠিছা (বাঁশের তৈরি ছোট বাঁশি) ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে ডিমাছা লোকনৃত্য বেশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। তবে ডিমাছা লোকনৃত্য প্রসঙ্গে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ যতীন্দ্রলাল থাওসেন বলেন—

> *"...ডীমাসা গানের মধ্যে যে আনন্দ রিক্ততা, তা নাচের শৈলীতে প্রভাবান্বিত হয়েছে। নাচকে তার নিবিড় উচ্ছাস থেকে বঞ্চিত করে তুলেছে। তাই ডীমাসা নাচের মধ্যে কলা বৈচিত্র্যের অভাব দেখি। তবে নাচের মধ্যে* ***art*** *আছে, কিন্তু* ***artistic*** *বা শৈল্পিক প্রয়োগের বড় অভাব; ভীষণ একঘেঁয়েমি।*

*কারুকর্মমণ্ডিত না হওয়ায় নাচ গানের মধ্যে **climax** বা **anticlimax** কোনোটাই পরিলক্ষিত হয় না।"*[৩]

সর্বোপরি ডিমাছা নৃত্যের অন্তরালে ফুটে ওঠে তাদের কঠিন সংগ্রামমুখর জীবিকাকেন্দ্রিক জীবনপ্রণালী। তাই, তাদের নৃত্যের বিষয় হয়ে ওঠে আক্রমণ, প্রতিরোধ, আত্মরক্ষা যুদ্ধ, খাদ্যান্বেষন ইত্যাদি।

গীত : মানুষের জীবনের আনন্দ উচ্ছাস কিংবা সুখ-দুঃখের নিরুচ্চার অভিব্যক্তি ঘটে সংগীতে। যে-কোনো জনজীবনের আনন্দ উল্লাসের ক্ষেত্র হল সংগীত। লোকসংগীত যেহেতু জীবনাশ্রয়ী; তাই ডিমাছা লোকসংগীতের অন্তরালে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থা, জীবনদর্শন নিহিত রয়েছে; রয়েছে আবহমানতার ছবি, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের কাহিনি। এই সম্প্রদায়ের যে-কোনো সামাজিক উৎসব, অনুষ্ঠান, সংগীত ছাড়া অসম্পূর্ণ। জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু ছাড়াও কৃষি, শিল্প, বিশ্বাস, সংস্কার সমস্তকিছুকে কেন্দ্র করে রয়েছে সংগীত। এমনকী কর্মজীবনকে উদ্যোগী করতেও সংগীত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। তবে সেই গান প্রকৃতিকে অস্বীকার করে নয়। উৎসবকেন্দ্রিক বিভিন্ন গানে তাই প্রকৃতি প্রেমের বর্ণময় রূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

লোকসংগীতে কথাই হল প্রধান; ডিমাছা লোকগানের বয়ানে রয়েছে জীবনের প্রতি অনুভূতি। সমাজের সাধারণ মানুষের সরল মন বিশ্বাস, আনন্দ, বেদনার ছবি হল এই গান। খেটেখাওয়া পরিশ্রমী মানুষকে কর্মদ্যোগী হওয়ার প্রেরণা জোগায়। তাই যে-কোনো জাতির সাংস্কৃতিক অঙ্গনে গানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কর্মদ্যোগী, সংগ্রামমুখর মানুষকে আরও উদ্যোগী হওয়ার বার্তা রয়েছে একটি ডিমাছা গানে—

"মাইঠাইডে গঁডাই ফাইবখা

ফাইডি আডুঙরাও ফাইডি
জ্লাঙ্মা ডাঁইডরাই ফাইবখা
ওয়াঠিলিং হা-য়াওনে ঠাংনাংফাই
ইয়াওডিনি খুরিসা ডিডাডা
ওয়াঠিলিঙ হা ফাইনে জিং ঠাংনাং
হাই, ওয়াঠিলিঙ হা ইয়াওনে ঠাঙয়াবাও।"

অনুবাদ :

"নতুন বছর এসেছে, এসো ভাইসকল
গ্রীষ্মের আগমন ঘটেছে,
টিলার জঙ্গল কাটতে হবে
হাতে কাচি নিয়ে
বাঁশের ঝাড় কাটতে চলো
ভাইসকল এসো, টিলার জঙ্গল কাটতে চলো।"

ডিমাছা সংস্কৃতির ধারা তাদের গানের মধ্যে দিয়ে ঐশ্বর্যমন্ডিত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ডিমাছা সমাজের প্রায় প্রত্যেকটি আচার-উৎসব-অনুষ্ঠানে গানের ভূমিকা রয়েছে। এমনকী তাদের ইতিহাস, প্রবাহমানতার কাহিনি বা উৎসের কথাও স্থান পেয়েছে তাদের গীতিতে—

"খাসায়বাম ডংবানী সাঁঈহাদে,
রাজাসাউ দুখুনীং সাওয়াইখা।
খাসায়বাম ডংবানী সাঁঈহাদে
রানী সাউ দুখুনীং সাওমাইখা।"

এর বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায় :

"খাসায়বাম রাজ্যে বসবাসকালে, রাজা এবং রাণী খুবই দুঃখে কালযাপন করেছেন।"

কিংবা,

"খাসয়বাম ডংবানী সাঁইখালি
জংপং জাং মাঈসুবা মাইজিখা
খাসায়বাম ডংবানী সাঁঈখালি
রাঙাইজাং মাঈ যাওবা ডিবুখা।"

এর অর্থ হল :

"খাসায়বামে বসবাসকালে, বর্শা লাঠি দিয়ে ধানকুটে খেতে হয়েছে এমনকী কুলায় ধান ঝেড়ে খেতে হয়েছে।"

এই গানের মধ্যে ডিমাছাদের অতীত ইতিহাসের স্মৃতি অনুরণিত হয়েছে। অবিরত যুদ্ধবিবাদে বিপর্যস্ত ডিমাছাদের দুঃখপূর্ণ তিক্ত অভিজ্ঞতাই যেন এই গানের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

সংগীতের মাধ্যমে একটি জনগোষ্ঠীর সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদ; প্রেম-ভালবাসা, সামাজিক, পারিবারিক জীবনের নিখুঁত বাস্তব ছবি প্রকাশ পায়। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান, উৎসব, আনন্দ, উল্লাস, দৈনন্দিন জীবনচর্যার বিভিন্ন দিক গানের বিষয় হয়ে উঠেছে। ডিমাছা সমাজে ও মননে এক আনন্দঘন মুহূর্তের সৃষ্টি করে 'বুসু' উৎসব। হেমন্তে সব ধরনের চাষবাস সমাপনের পর ক্লান্তিকে ভুলে গিয়ে ফসল প্রাপ্তির আনন্দে সবাই বুসু উৎসবে মেতে ওঠেন। এই উৎসবের সাক্ষী হয়ে ওছে তাদের নৃত্য, সংগীত। তাই উৎসব সংক্রান্ত একটি গানে রয়েছে দুঃখ-বেদনা ভুলে গিয়ে আনন্দে মেতে ওঠার জন্য আহ্বান—

"শিবারাই রিবানী সাঁই মাইবা
বসাইনকে রিখিহী সাঁই মাইবা
সাঁইজ্রাডজী জাংসে সাঁই মাইবা
ওয়াইমুসা সিলিকবো ওয়াইদানাং
মিরিমসা সিলিকবো ওয়াইদানাং
... ...
ওয়াইমুখে খারাঠং খেপরেহা
খাজাকে না সুদিং সুখুহা

এর গদ্যানুবাদ :

"শিবারাই-এর কৃপায় দিনটি পেয়েছি, অনেক প্রতীক্ষার পর দিনটি পেয়েছি, আর চিন্তা করো না, সংসারের চিন্তাকে ভুলে গিয়ে, আনন্দকে আহ্বান করো।"

'বুসু' কয়েকটি পর্বে বিভক্ত। প্রত্যেকটি পর্বেই সমানভাবে গ্রামের যুবক-যুবতী, শিশু-কিশোর এবং প্রবীণরা আনন্দে মেতে ওঠেন। উৎসবকেন্দ্রিক বিভিন্ন আচার পালনের পাশাপাশি অন্যতম একটি অপরিহার্য উপাদান হল গান। 'হাংস বুসু' পর্বে গীত হওয়া একটি গানে দেখতে পাই ফসল লাভের আনন্দে মতোয়ারা কৃষকের উৎসাহবাণী—

"হাই! রাজাসিনিবা বাবারাও
ওয়াইমুসা ওয়াইলিকবো ওয়াই দানাং
জালাংমা ডাঁইডরাই বাঁডাইনহা বাবারাও
নিং খরমন আং খরমন ডংবানী
হাই জালাংমা ডাঁইডরাই বঁডাইনখে

বাঁসাঙ্গখে বাডাইহি ডাংবুখা
হাই হাসিলিখ সঙসসি সংবুখা
জালাইজাং খুনসডি লুসখা
হাই! ডিনিনি সাঁইনরাওলি বাঁসাইনখে
গজাউজাং স্মাইব মাইনাঙয়া
হাই! শিবারাই সাংসাইবা গালাংবা
মাইথাইরিক ড্জিনি বাঁসাইখে
বাঁসাইখে সাঁইরিখি ডাংবুবা
ডিনিনি হরাউলি বহরহা
ফাই জালাইজাং সঙস্স্মাই সাঁঙ্গজবা
গ্রাজাং খামস্মাই হরজরা
ডিনিনি হরাউলি হরখে
গুফুজাং স্লাইব জিং মাইয়া
ফাই বাইলাডি বাবারাও সামারাও
ইয়াসিঙলু হা-নাংয়া বাইলাডি।"

এর মূলভাব হল—

"হায়! আমার আদরের ছেলেরা, তোমরা চিন্তা করোনা, গত ছয়মাস আমরা পরিশ্রম করেছি, সকলে মিলেমিশে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করেছি, এবার সকল কষ্ট দুঃখ ভুলে গিয়ে প্রবীনদের আশীর্বাদ নিয়ে আনন্দের সঙ্গে নৃত্য গীতে মেতে ওঠো।"

এই সামাজিক উৎসবে মুখ্য ভূমিকা নেয় 'নদ্রাং'-এর যুবকেরা। গ্রামের

যে-কোনো উৎসব-অনুষ্ঠান, বিশেষ করে বুসু উৎসবে নদ্রাঙের যুবকরাই স্বতঃস্ফুর্তভাবে পরিচালনা করে। নদ্রাঙকে কেন্দ্র করে গীত হওয়া গানকে বলা হয় 'নদ্রাং ঠুবানী রাজাপঠাই' অর্থাৎ 'নদ্রাঙের গান'। এই গানগুলি বেশিরভাগই উপদেশমূলক এবং একক। সচেতন প্রবীণরা ভবিষ্যতে যাতে ভাত-কাপড়ের অভাব না হয়, তাই কঠোর পরিশ্রমী হওয়ার জন্য যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান করেন গানের মাধ্যমে—

"নাইযুনী ডাউনাইযু গিসিখা
মুদরী লাইহিডে জায়াখা
সাঁইসিনি বাঁসাইডে ফাইবুখা
বাইজাহি হশিলিং হখাসে আদুংরাও
বাইজাহি বরণফাং কামখাসে আজাংরাও
ফাগেরা হবুডী ঠাউবুমা।
মাগেরা ডাউবুডী ঠাউবুমা।।"

অনুবাদ :

"প্রভাত পাখি ডাকছে
আর ঘুমালে চলবে না
নতুন দিনের শুরু, ভাইয়েরা বাঁশ বেতের কাজ করো আর
বোনেরা তাঁতের কাজে হাত দাও
তবেই তো পূর্বপুরুষের কৃষ্টি বেঁচে থাকবে।''

আবার—

"রাজাসিনিবা আদুংরাও
নিনিবা ডাখুরী ডাগেরা

গ্রাওমা ঠাইসিলাই আঙ জড়ু
খ্মাউজু খিম খাওহি ডাহিডি
হরসিনি হরপাইবা ফ্রাংলা,
ঠুয়ালাই হরপাইবা ফ্রাংলা
ঠুহিনিং মুদরী লাইলাংডি আজাংরাও
ঠুহিনিং ঠুসাউমি নাইলাডি
ঠুয়ালাই হাখংমা গাখাডে আজাঙরাও
জালাইজাং হাসিলিখ জিং সংবা
জালাংমা সাঁই রাওডাও বাঁসা ইহা
সাঁইযুগনি মুখুমবার জাবুবা।”

অনুবাদ :

“শোনো আমার ভাইয়েরা
দাদা হিসেবে কিছু বলছি
সবাই মন দিয়ে শোনো
রাত্রি এসেছে ঘনিয়ে
ভাইয়েরা নিদ্রা যাও, সুস্বপ্ন দেখ

ও আমার ভাইয়েরা
যদি তোমরা জেগে থাক
রাতের অন্ধকারে ঘুরে বেড়াও
অন্ধকার রাতে পায়ে কাঁটা বিধে
ক্ষত করতে পারে

ও আমার প্রিয় ভাইয়েরা
এসো আমরা একসাথে কাজ করি

প্রখর গ্রীষ্মের ঝলসানো তাপে
দীর্ঘ কঠোর কর্মে মেতে উঠি।”

ডিমাছা সমাজ নিজের কৃষ্টি, শিল্প, সংস্কৃতি সম্পর্কে সর্বদা সচেতন। তাই পূর্বপুরুষের কৃষ্টিকলাকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদ পরিলক্ষিত হয় কোনো কোনো গানে—

“ফানিবা গারাওজু লাখাডে
জালাইখে ডাংবা নিংডেনাং
মানিবা গারাওজু লাখাডে
জালাইখে দাওহার নিংডেনাম।”

অনুবাদ :

“বাবার কথা শুনলে
কাজে পটু হবে
মায়ের কথা শুনলে
বুননের কাজে পটু হবে।”

এখানে বস্ত্রবয়নে পটু মায়ের পথ অনুসরণ করার নির্দেশ রয়েছে। বস্ত্রবয়ণ প্রীতির যে পরিচয় ডিমাছা লোকগানে পাওয়া যায়, তাতে মহিলাদের মননশীল রুচিবোধ ও শৈল্পিক বোধের দিকটি স্পষ্ট হয়।

লোকসংগীতের একটি অন্যতম শাখা হল কর্মসংগীত। এইসব সংগীতের মধ্যে স্থান পায় কৃষিকর্ম, চাষবাস সর্বোপরি জীবিকান্বেষণের বিভিন্ন দিক। পার্বত্য অঞ্চলের ডিমাছাদের ঐতিহ্যপূর্ণ সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে জুমচাষ। জুমচাষ তাদের জীবিকা অর্জনের একটি অন্যতম ও প্রধান উৎস। প্রতিটি পরিবার নিজের পছন্দসই জঙ্গলের কিছুটা অংশে গাছপালা

কেটে পরিষ্কার করে। কিছুদিন পর সেই জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। জঙ্গল পুড়ে ছাই হয়ে গেলে বছরের প্রথম বৃষ্টিপাতের পর সেই জমি চাষের উপযোগী হয়ে ওঠে। তখন নিজের পছন্দ অনুযায়ী সেই জমিতে ধান, কুমড়ো, ঝিঙা, লাউ, হলুদ, আদা, লঙ্কা ইত্যাদি বীজ রোপণ করা হয়। এভাবে অনেক পরিশ্রমের বিনিময়ে কষ্টার্জিত ফসল নিজের ঘরে তুলতে সক্ষম হয়। এই জুমচাষ ডিমাছাদের সাহিত্যে, সংগীতে, লোককথায়, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। জুমচাষকে কেন্দ্র করে যেসব গান রয়েছে, তার কিছুটা এখানে তুলে ধরা হল—

ডাংবা জিবানী রাজাপঠাই (জুমচাষে আহ্বানমূলক গান) :

"ফাইঠাংনাং আডুংরাও ফাইঠাংনাং
ফাগেরা ডাংবুডি ডাংমানে
ফাই ঠাংনাং আজাংরাও ফাইঠাংনাং
মাগেরা ডাংবুডী ডাওমানে
মা সংবা মাইসেনসা ইয়াওডিগি জিং ঠাংনাং
ফাইলাইডি আডুংরাও জিং ঠাংনাং
মাখুরী মাইসেনসা সংয়াবা
মাইসেনসা ইয়াওডিহি জিং ঠাংনাং
সাঁইজুরাং সাঁইজুরাং জাপাইখা
জালাইজাং হাখংমা গালাইনাং
সাঁইজুডাউ জুডাওনিং জাপাইখা
বুঠুজাং ডিখংমা লুলাইনাং
বুঠুজাং হারিমাই সংঠিনাং
খুডিপং বজরখে রিখিহি

মাগেরা ডাংবুডী ডাংহিনাং
খনাডি আডুংরাও খনাডি
ফাই ঠাংনাং আজাংরাও ফাইঠাংনাং।”

অনুবাদ :

“এসো ভাইয়েরা, পূর্বপুরুষের কাজে যাই, বোনেরা এসো, মায়ের কাজের শিক্ষালাভ করি, মায়ের রান্না করা খাবার নিয়ে আমরা যাব, জুমের ক্ষেতে, ভোর নেমে এসেছে, চলো উঁচু পর্বতে, ভোর পেরিয়ে দিনের আলো ফুটেছে, আমাদের পর্বত উপত্যকা ডিঙোতে হবে, সবাই মিলে কোদাল হাতে, মায়ের শেখানো কাজে নেমে পড়ি।”

হা-ইয়াওবানী (জুমক্ষেতে জঙ্গল কাটার গান) :

জুমচাষের প্রথম ধাপ হল বনজঙ্গল পরিষ্কার করা। যেমন— বাঁশের ঝাড়, শনের বন ইত্যাদি। জঙ্গল পরিষ্কার করার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে একটি গানে—

“মাইঠাইডে গ্ঠাঁই ফাইবুখা
ফাইডি আডুংরাও ফাইডি
জালাংমা ডাঁইডরাই ফাইবুখা
ওয়াথিলিং হা-ইয়াওনে ঠাংমানে ফাই
ইয়াওডিনি খুরিসা ডিডাডা
ওয়াথিলিং হা-ইয়াওনে জিং ঠাংনাং।”

অনুবাদ :

"নতুন বছর এসেছে
ভাইয়েরা এসো
ছয়মাস পর গ্রীষ্ম এসেছে
চলো আমরা বাঁশঝাড় কাটতে যাই
হাতে দা নিয়ে
আমরা বাঁশঝাড় কাটতে যাই।"

জুমক্ষেতে ধানরোপণকে কেন্দ্র করে একটি গানে উঠে এসেছে রোপণের প্রসঙ্গ। রোপণকেন্দ্রিক এই গানকে বলা হয় "হা ডুবানী রাজাপঠাই' (ধান রোপনের গান)।

"ফাই ঠাংনাং আড়ুংরাও
খুড়ীসা বাঁইলাইহি ঠাংলাইনাং
হাঠালাউ রাংডাওবো দুখাসে
ডাংবানী ক্বাউসি মাইজিমা।"

অনুবাদ :

"এসো ভাইবোনেরা, ছোট্ট কোদাল কাঁধে নিয়ে,
আমরা যদি কোদাল চালাই, তাহলেই একমুঠো
খেতে পারব।"

শামফিঠরনী রাজাপঠাই (আগাছা পরিষ্কারের গান) :

জুমক্ষেতে বীজ রোপনের পর মাঝে মাঝে ধানক্ষেতের ঘাস লতাপাতা নিয়মিত ভাবে পরিষ্কার করতে হয়। যুবক-যুবতীরা এই ঘাস পরিষ্কারের কাজে নিয়োজিত হয়। আগাছা পরিষ্কারের প্রসঙ্গ রয়েছে একটি গানে। যুবক-যুবতীরা ঘাস পরিষ্কার করতে করতে একে অপরের উদ্দেশ্যে গান

করে—

নাগা : *"বারসিরি সারাসে বার ফাইডু*
ডুং রাওঠি গিসিপাসা ইয়াওডিবা।"

অনুবাদ :

যুবক : *"ঝিরিঝিরি বাতাস বইছে*
বোনেরা কী পাখা দিয়ে বাতাস করছ।"

মাটলা : *"বারানিং জিংরাওলা গিসিপসা ইয়াওদিনাং*
হাস্রীম শংবানী বারস্‌রা
বখেসে ডারাউলা গিসিপসা ইয়াওডিবা বাউলাবা।"

অনুবাদ :

যুবতী : *"আমরা কোথায় পাখা পাব*
পাহাড়ের গায়ে যে আসা মৃদু বাতাস
দাদারা ভাবছ আমাদের পাখার বাতাস।"

শুধু জুমচাষ নয়, সমতল অঞ্চলে ধান চাষও ডিমাছাদের অন্যতম প্রধান জীবিকা। তাই ধান কাটার প্রসঙ্গ গানের মধ্যে স্থান পেয়েছে। এই গানকে বলা হয় 'মাই-রাঠরনী রাজপঠাই'।

"ফাইঠাংনাং ফাইঠাংনাং
লুগুরাউ মাইসা গাইলাইনাং
বাইগডি বাইগডি
লুগুরাউ মাইসা সাইলাইনাং

হাড়ুবুহা মাইসা সাইহি
ডাংবাখে ম্‌লাইনে ফুনুনাং।”

অনুবাদ :

“এসো এসো বন্ধুগণ
ধান রোপনে চলো
বেরিয়ে পড়ো বন্ধুগণ
ধানবীজ ছেটাতে চলো
জমিতে ধান ছিটিয়ে চারা রোপন করে
সবাইকে কাজকর্ম শেখাতে চলো।”

লোকসংগীতের অন্যতম শাখা হল প্রেমসংগীত। প্রেমগীতের আবেদন বিশ্বজনীন ও হৃদয়গ্রাহী। নরনারীর একে অপরের প্রতি আকর্ষণ চিরকালীন ও স্বাভাবিক। ডিমাছা সংগীতের ক্ষেত্রেও তার তারতম্য ঘটেনি। এরকম একটি গানে দেখি প্রেমিকযুবক তার ভালবাসার পাত্রীকে প্রেম নিবেদন করে বলছে—

“মাজাংডি আজাং হাই
আং ঠিবা গারাও লানাংঠি
আং ঠিবা গারাও লাখাডে
নামারাউনি সাগাংহা
বাটি রিবা জাডাডা গারাও সাইনাংমু
আং জবা গারাও লাখাডে
নাপারাউনি সাগাংহা
জুডি রিবা জাডাডা গারাও সাইনাংমু।”

অনুবাদ :

"হে সুন্দরী প্রণয়িনী, আমার কথা রাখ যদি,
তোমার মায়ের কাছে, কাজের ছলে বিয়ের প্রস্তাব
রাখব, তোমার বাবার কাছে 'জুডি' দেওয়ার ছলে,
বিয়ের প্রস্তাব রাখব।"

ডিমাছা প্রণয় সংগীতের সীমানায় বহুচর্চিত ও প্রচলিত সংগীত হল 'মাজাংডিনি রাজাপঠাই' (সুন্দরী প্রণয়িনীর গান)।

সুন্দরী যুবতীর যৌবন সৌন্দর্যে মুগ্ধ ডিমাছা যুবকের ভাষায় প্রণয়িনীর রূপ-লাবণ্য বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

"খ্না, মাজাংডি বাবিলি, খ্না মাজাং মাজাংস
হাই, নিনি খুরি নডাডে ডিনি শুকরী বাঁসাইহা
হাই, মিয়াসানি হাখংমা
হাখং গাপালাই আঙ ফাইবা
ডিখংমা লুপালাই আঙ ফাইবা
হাই হাখংমা গাপালাই ফাইবাডে
ডিখংমা লুপালাই ফাইবাডে
মাজাংডিনি সাউগরিখে মুফাইবা
মাঙরাওলিখে নুফাইবা
হাই, মাউরাওলিখে নুবাডে, মাঙরাউলিখে নুবাডে
হাই ডাঙহি জিয়া জিঠাউঠাউ
ডাওহি গাঁইয়া গাঁইথাওঠাও নাডা নুলাংখা।"

অনুবাদ :

"শোনো, সুন্দরী প্রণয়িনী
হায়, তোমার রূপে মুগ্ধ আমি, শোনো আমার দুঃখগাথা
যা ঘটেছে গত শুক্রবার
আমি সমর্থ যুবক এক
এসেছিলাম আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে
এসেছিলাম নদীপথ অতিক্রম করে
নদী পাহাড় ডিঙিয়ে এসে
সুন্দরী সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছি
হায়, তোমার দেহসৌন্দর্য দেখে
আমি তোমাকে প্রস্তাব দিতে বাধ্য হয়েছি।"

এর জবাবে নায়িকা বলছে :

"খ্না মাজাং মাজাংডাও
হাই, ডিনি সুকরী বাঁসাইহা
হাখংমা গাপালাই ফাখিবো
হাই মাসাইডিকনি হাখংমা
মাঁসাইজিকনি ডিখাংমা
ডিখংমা লুফালাই ফাইবাহা
হাই মাজাঙডাও জাং ডাডা দাং
ডাঙহি জিমা গ্রাউডে ডাওহি গাঁহা গ্রাওডে
ডাডা ডানাংনিয়া।"

অনুবাদ :

"শোনো, হে যুবক
তুমি এসেছ শুক্রবার দিনে

আর তুমি আমাকে প্রস্তাব দিয়েছ
তবে দুঃখের সঙ্গে বলছি
আমি তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারছি না।”

প্রময়মূলক গানে বিচ্ছেদ বা বিরহের সুরই প্রাধান্য পায়। বিরহিনী নারী ও পুরুষের হৃদয় বেদনা ও চিরন্তন প্রেম নিবেদন এতে নিহিত থাকে৷ ডিমাছা লোকগীতিকার প্রধান উপজীব্য এই প্রেম-বিরহ-মিলন। তাই লোকগীতিকায় প্রেম, বিরহ, মিলন সমন্বিত হৃদয় অবস্থার প্রকাশ ঘটেছে।

লোকবাদ্য : নৃত্য ও সংগীতকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে বাদ্য। যে কোনো বাদ্রযন্ত্র সংগীতকে করে তোলে সুন্দর ও সম্পূর্ণ। ডিমাছাদের ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে রয়েছে খ্রাম (ঢোল), মুড়ি (বড় বাঁশি), মুড়িসা (ছোট বাঁশি), সুফিন (ছোট চিকন বাঁশি) ইত্যাদি।

খ্রাম (ঢোল) :

খ্রাম একটি উল্লেখযোগ্য বাদ্যযন্ত্র। এর দৈর্ঘ্য ৭৮ সে:মি:। এটি গামাই কাঠ দিয়ে তৈরি। এর ভেতর ফাঁপা রাখা হয়।

খ্রাম ডবং (ছোট ঢোল) :

কাঠের তৈরি একধরনের ছোট ঢোল যা ডিমাছা নৃত্যগীতের এক গুরুত্বপূর্ণ বাদ্য।

মুড়ি (বাঁশি) :

ডিমাছা বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাদ্য হল মুড়ি বা বাঁশি। যা বেতের তৈরি এবং এর দৈর্ঘ্য ১০৫ সে:মি:। একটি সম্পূর্ণ মুড়ি তিনটি ভাগে বিভক্ত। মুড়ির প্রথম ভাগতে বলা হয় ‘মেমু’। দ্বিতীয় ভাগ হল ‘মুড়ি’

যা শব্দ নির্গমণ করে, তৃতীয় ভাগ হল 'খুডাম' এবং চতুর্থ ভাগ হল 'মুড়িগং'। যেখানে ছ'টি ছিদ্র থাকে, শেষ অথবা পঞ্চম ভাগ হচ্ছে 'মুড়িবার' যা গভীর শব্দ তৈরি করে।

সুফেন (বাঁশি) :

এর দৈর্ঘ্য ৩০ সে:মি: এবং ছটি ছিদ্র থাকে।

মুড়িসা (ছোট বাঁশি) :

মুড়িসা ছোট বাঁশি। এর ছ'টি ছিদ্র এবং দৈর্ঘ্য ২৫ সে:মি:।

(খ) পোষাক পরিচ্ছদ :

যে কোনো দেশ বা জনগোষ্ঠীর সাজপোশাকের মধ্যে তাদের সভ্যতা সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে৷ আবার পোষাক পরিচ্ছদের মাধ্যমে কোনো জনগোষ্ঠীর আর্থিক অবস্থা, রুচিবোধ, সৌন্দর্যবোধ এবং সাংস্কৃতিক দিকটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে৷ ডিমাছাদের পোশাক পরিচ্ছদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তাদের ঐতিহ্যগত, শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ডিমাছা মহিলারা পরম্পরাগতভাবে প্রত্যেকেই এক-একজন দক্ষ বয়নশিল্পী। তারা নিজেরাই নিজেদের পোশাক তৈরি করতে আগ্রহী। অনুপমা নাইডিঙের ভাষায়—

> *"ডিমাছা মহিলাদের তাঁতে বোনা কাপড়-চোপড় বা পোশাক পরিচ্ছদ মহিলাদের শিল্প নৈপুণ্যের পরিচায়ক৷ তারা বনজ লতাপাতা, গাছ-গাছড়া থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় কাপড়ের সুতোর জন্য রঙ প্রস্তুত করে থাকে৷ ...এসবের মধ্যে তাদের নিজস্ব কৃষ্টির একটা স্বরূপ ধরা পড়ে৷"*[৪]

ডিমাছা মহিলাদের সঙ্গে বস্ত্রবয়ন শিল্পের যোগ চিরকালের। তারা

এন্ডি-মুগা, রেশম উৎপাদন করে এবং তা থেকে বস্ত্র বয়ন করে। বীজ থেকে তুলা ছাড়ানো, তুলা ধুনা, সূতাকাটা, সূতায় রঙ করা থেকে তাঁতে কাপড় বোনা পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মের সঙ্গে ডিমাছা মহিলারা যুক্ত থাকে। এই সমাজে মেয়েদের কাপড়বোনা মেয়েলি শিল্প হিসেবে বিবেচিত হয়। পোশাক নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা যায় ডিমাছা মহিলারা উজ্জ্বল রঙের পোশাক পছন্দ করে। হাতে বোনা বিভিন্ন পোশাকে রঙিন সুতার নক্সা এক স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য বহন করে। মহিলাদের বিভিন্ন পোশাকের মধ্যে রয়েছে— রিগু (মেখলা), রিঝাম্পাই (কটিবন্ধ), রিকাউসা (চাদর বা ওড়না), রামাই (ছোট ওড়না)। মেখলার পাড়ে বিভিন্ন রঙিন সুতোর নক্সা কাটা হয়। আলাদা আলাদা নক্সার আলাদা আলাদা নাম রয়েছে। এই নক্সাগুলো হল—

১.	ডিলাম বাঠাই	৯.	ডাউসা
২.	ডিলাম বালাই	১০.	গুংগুর ডাঁইস্লে
৩.	রইনা রেনসি/রেনগ্নি	১১.	রইনাসা মেসেরমস
৪.	প্রাফাং ইয়াক্রি	১২.	গুয়াই-ইয়াদের
৫.	প্রাফাং বাসা/গেডেবা	১৩.	সৃমটাইমুন
৬.	মিসা	১৪.	প্রাবসো
৭.	জেগ্রেংসা	১৫.	বেমায়সি লাইসেব
৮.	মজসা		

আবার চাদর বা ওড়নার আঁচলে এবং পাঁড়ে যে নক্সা তোলা হয়, নক্সা অনুসারে এগুলোর নাম হল—

১.	খালং	৭.	খুডামপ্লা
২.	হরাইমিন	৮.	ঠাইডিবার
৩.	হরাই গিলি	৯.	হামুন

৪. হরাই গ্রা
৫. ডিডিগসা
৬. ডিশ্রু খারনাই
১০. কামপ্লাই বশ
১১. পাণ্ঠাও বার
১২. গিছির, ইত্যাদি

বক্ষবন্ধনীকে বলা হয় 'রিঝাম্পাই'। এই রিঝাম্পাই-এর নক্সার নাম হল—

১. পানঠাওবার
২. কামপ্লাই বশ
৩. গিসির

পুরুষদের বিভিন্ন পোশাকের মধ্যে রয়েছে রিমসাউ (চাদর), সাগাউফা (পাগড়ি), রিসা (গামছা), রিমাই (গলাবন্ধ) ইত্যাদি। পুরুষদের গামছায় যে নক্সা তোলা হয় এগুলো হল—

১. রইনা শুকুন
২. ঠরিসামিণ, ইত্যাদি

ডিমাছাদের ব্যবহৃত পোষাকে বিভিন্ন নামাঙ্কিত নক্সায় তাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ও পরিবেশের ছবি ফুটে উঠেছে। পরম্পরাগত পোশাকের পাড় এবং নক্সায় তাদের ঐতিহ্য পরিবেশকে তুলে ধরা হয়েছে যা কোথাও রেখাভিত্তিক কোথাও জ্যামিতিক আবার কোথাও কেবল প্রাকৃতিক ফুল, লতা, পাতা ইত্যাদি।

অবশ্য স্থানভেদে ডিমাছাদের পোশাকে নক্সাগত পার্থক্য রয়েছে। যেমন— ডিজোয়া (ডিমাপুর) এবং ডেমরা (লঙ্কা) অঞ্চলে মেখলার ফুলের নক্সা কিছুটা আলাদা। যেমন—

১. গড়াই ডিজোয়া
৪. ঠাইডিবার

২. গিসিব ঠাইডো
৩. গিসিব ঠাইজাই
৫. মিয়ুং ডিজোয়া
৬. রাদাউলাই, ইত্যাদি

তবে স্থানবিশেষে বস্ত্রবয়নের ধরনে পার্থক্য থাকলেও পদ্ধতি একই। এই সমস্ত বস্ত্রবয়ন শিক্ষা ডিমাছা কিশোরী যুবতীরা বয়স্ক মা-ঠাকুমাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে শিক্ষা লাভ করে। এমনকি এখনও কোন কোন গ্রামাঞ্চলে বস্ত্রবয়নে অপটু মেয়েদের বিবাহে অযোগ্যা বলেই বিবেচিত হয়।

সাজপোশাকের অন্যতম এক অঙ্গ হল অলঙ্কার। অলঙ্কারের প্রতি মেয়েদের আগ্রহ ও আকর্ষণ চিরকালের। ডিমাছা মহিলারাও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। সোনা-রূপা, তামা, মণিমুক্তাখচিত বিচিত্র ধরণের অলঙ্কারের প্রতি তাদের দুর্বার আগ্রহ। ডিমাছা মহিলাদের ব্যবহৃত ঐতিহ্যবাহী অলঙ্কারের মধ্যে রয়েছে—

১. চন্দ্রয়াল (চন্দ্রহার) :

এটি রূপার তৈরি হার। ফুলের নক্সা করা এই হার তিনটি সারিতে আবার কখনও চারটি সারিতে তৈরি হয়। একটিমাত্র সারিতে তৈরি চন্দ্রহারকে বলা হয় চন্দ্রয়াল রেনসি, তিনটি সারি হলে বলা হয় চন্দ্রয়াল রেনঠাম, চারটি হলে বলা হয় চন্দ্রয়াল রেনব্রি।

২. পোয়াল (মালা) :

এটি প্রবাল এবং রূপোর গুটি খচিত হার।

৩. জংসাম (হার) :

জংসাম হল একধরনের হার যা ছোট ছোট রঙিন পুতি, রূপোর গুটি এবং ছোট প্রবাল দিয়ে তৈরি।

৪. রঙবারসা (হার) :

এই হার তৈরি হয় পুরনো মুদ্রা দিয়ে।

৫. খাড়ু (বালা) :

এই খাড়ু রূপোর তৈরি। বিয়ের পর বিবাহিত মহিলারা এই খাড়ু পরিধান করে।

৬. খামাউঠাই (কানপাশা) :

ডিমাছা মহিলাদের ব্যবহৃত খামাউঠাই বা কানের দুল রূপা অথবা সোনা দিয়ে তৈরি হয়।

৭. খুমলিংলাং (দুল) :

এটি সোনা অথবা রূপার তৈরি অলঙ্কার। খুমলিংলাং বেশিরভাগ কমবয়সি মহিলারা, যুবতীরা ব্যবহার করে।

৮. য়াউসিডাম (আংটি) :

ডিমাছা পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে হাতের আঙুলে য়াউসিডাম বা আংটি পরে।

(গ) খাদ্য পানীয় :

খাদ্য পানীয় রীতি, রন্ধনকলার বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে যে কোন জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। উত্তর পূর্ব ভারতের অন্যান্য জাতিদের মতো ডিমাছাদের খাদ্যাভাস অনেকটাই সাধারণ।

ডিমাছারা মূলত কৃষিজীবী এবং তাদের প্রধান খাদ্য ভাত। পার্বত্য

অঞ্চলে বসবাসকারী ডিমাছাদের প্রধান জীবিকা জুমচাষ। তবে সমতল অঞ্চলে হাল, লাঙল, গরু, মোষ দিয়ে চাষের কাজ করা হয়। ধান, শস্য, শাকসব্জি ইত্যাদি উৎপাদন করা হয়। সমতল অঞ্চলে ধান ছাড়া ঠাঠাই (আলু), পানটাও (বেগুন), মিলাউ (লাউ), সাবাই (সীম), স্বাই হা (কলাই), য়াওলাই (শস্য), কাউক্লু মংগ্লাই (মিষ্টিকুমড়ো) ইত্যাদি উৎপাদন করা হয়। ডিমাছাদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে— মাছ, মাংস, ডাল, সব্জি, শুকনো মাছ (না গ্রাঁই) , সেদল (নাপ্লাম)। এর পাশাপাশি ফলমূল, বনজ শাক-সব্জি ও সুগন্ধিযুক্ত লতাপাতা তাদের নিত্য তালিকায় স্থান পেয়েছে।

ডিমাছাদের রন্ধনপ্রণালী কিংবা সামলাই-বনলাই (তরি-তরকারি) নির্বাচন অন্যদের তুলনায় অনেকটাই সহজ। অতিরিক্ত মশলার ব্যবহার তাদের খাদ্যতালিকায় দেখা যায় না তবে এই জাতির খাদ্যাভাস পরিবর্তন আসে যখন রাজধানী কাছাড়ে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু যারা পার্বত্য অঞ্চলে থেকে যায় তাদের খাদ্যাভাসে তেমন পরিবর্তন আসেনি।

> ***"The Kacharis who came down to the planes of cachar and came to be known as Barmans given up eating of chicken and pork considering then dietary taboos. But this was not so in the case of Dimasas of North cachar except but they ate all kinds of meat the most favourite being pork. Rice was the principal food."*** [৫]

তাদের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য তালিকায় রয়েছে 'মুদ্রু'। 'মুদ্রু'তে তেল ব্যবহার করা হয় না। আলু, সীম, টমেটো বিভিন্ন বনজ লতা-সব্জি ইত্যাদি

দিয়ে লবন, লঙ্কা দিয়ে জলে সেদ্ধ করা হয়।

খাদ্যতালিকার অন্যতম প্রণালী হল 'খারি সামলাই' (খারযুক্ত তরকারি)। বিভিন্ন শাকসব্জি দিয়ে তেল ছাড়া জলে সেদ্ধ করে তাতে নাপ্লাম (সেদল) দিয়ে তৈরি করা এই তরকারি ডিমাছাদের প্রিয় খাদ্যতালিকার অন্যতম। এছাড়াও রয়েছে 'গুডুয়াবা' বা 'ব্রেংয়াবা'। এই প্রণালী অনেকটাই পাতুড়ির পদ্ধতিতে তৈরি হয়। ছোট মাছ, লঙ্কা, লবন, হলুদ পেঁয়াজ দিয়ে মেখে কলাপাতায় মুড়ে তা বাঁশের চোঙায় ভরে উনুনে ঢুকিয়ে সেদ্ধ করা হয়। এই রন্ধনপ্রণালীক বলা হয় গুডুয়াবা। একই পদ্ধতিতে 'বিরুণ' (বিন্নি) চাল ও জল বাঁশের চোঙে ভরে সেদ্ধ করা হয়। এই সেদ্ধ করা চালের ভাতকে বলা হয় 'ব্রেংয়াবা'।

'হনডাব' ডিমাছা খাদ্যতালিকার অন্যতম প্রণালী। বাঁশের কোঁড় (মিয়াঃ) , কলার মোচা ইত্যাদি হনডাব তৈরির অন্যতম উপকরণ। কলার মোচা বা বাঁশের কোড় দিয়ে সেদল, চালের গুড়ো দিয়ে তৈরি এই উপকরণ তাদের প্রিয় খাবার তালিকার অন্যতম।

ঐতিহ্যগত এইসব খাবার ছাড়াও সমতল কাছাড়ে বসবাসকারী ডিমাছাদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে বিভিন্ন রকমের মাছ। নাগাজাউ (রুই), হুলসা (শোল), না হামাও (চাপিলা), নাসুগ্রাং (শিঙ), নাহুসা (পাবদা), নাবঙ্গ (কই), নাঠু (চিংড়ি), নামাঃ (চিতল), নাওয়া (বাচা) ইত্যাদি। মাংসের তালিকায় রয়েছে— বুরুণ (পাঠা), বুরুন মেলমা (ভেড়া), কুসং (কচ্ছপ), মিসাইঙ্গ মস (হরিণ, ডাউন (মুরগী), ডাউপ্লামডু (হাঁস), ডাউপ্লাংগী (চীনা হাঁস), ডাউপ্রী (কবুতর) ইত্যাদি।

খাদ্য তালিকায়, রন্ধন প্রণালীতে নিজস্বতা বজায় থাকলেও আজকাল তাদের প্রণালীতে ও রুচিতে অনেক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে

শহরাঞ্চলের ডিমাছা মহিলারা বিভিন্ন মশলার ব্যবহার করার পাশাপাশি বিভিন্নরকম বৈচিত্র্যপূর্ণ খাবার-দাবার তৈরিতেও পারদর্শী হয়ে উঠেছে এবং শুধু শরহাঞ্চলেই নয় সমতল কাছাড়ের বিভিন্ন গ্রামে বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাবে খাদ্যতালিকায় তেল, ঘি, মশলা ইত্যাদির জনপ্রিয়তা লক্ষ করা যায়।

ডিমাছা জীবনধারার প্রাত্যহিক জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিয়েছে জুডিমা (লাউপানি বা ঘরে তৈরি দেশীয় পদ্ধতিতে মদ)। সামাজিক যেকোনো অনুষ্ঠান, উৎসব, পার্বণ, পূজা ইত্যাদিতে এই 'জুডি' অপরিহার্য। ডিমাছা সংস্কৃতির সঙ্গে এর যোগ আবহমান কাল ধরে এবং এই 'জুডি' তাদের কাছে প্রধান পানীয় হিসেবে বিবেচিত৷ জুডি প্রস্তুত প্রণালীতে মহিলাদের ভূমিকাই মুখ্য। এই পানীয় তৈরির প্রণালী বেশ জটিল। এর প্রধান উপকরণ হল চাল এবং টেম্রা (যষ্টি মদু) গাছের ছাল মেশানো চালের গুড়োর তৈরি পিঠা। যাকে ডিমাছা ভাষায় বলা হয় 'হমাও'। প্রথমে 'টেম্রা' (যষ্টি মধু) গাছের ছাল শুকিয়ে গুঁড়ো করে নিতে হয়। টেম্রার গুড়োর সঙ্গে চালের গুড়ো মিশিয়ে জল দিয়ে মেখে 'হন' বা পিঠা তৈরি করতে হয়। পিঠা তৈরির পর এগুলো 'জাংগ্লাই'এ (বড় ডালা) কিছুদিন রেখে দেওয়া হয়। প্রায় মাসখানেক থাকার পর এই পিঠা 'জুডি' তৈরির উপযুক্ত হয়ে ওঠে৷ তারপর 'বাইরেঙ' (বিন্নি চাল) চালের ভাত রান্না করে তা কিছুক্ষণ রেখে দিয়ে ঠান্ডা হওয়ার পর সেই 'হমাও' (পিঠা) গুড়ো করে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এই মিশ্রণ সপ্তাহ খানেক রেখে দেওয়ার পর মিশ্রমে রস জমে ওঠে; সেই মিশ্রণে জল ঢেলে রস বের করা হয়। এই জুডি/জুডিমা সামাজিক মর্যাদা তথা ঐতিহ্যের পরিচায়ক বলে বিবেচিত হয়।

বিভিন্ন রকমারী ঐতিহ্যগত তরকারি ছাড়াও ডিমাছাদের খাদ্যতালিকায় রয়েছে পিঠাপুলি। হাতে বানানো পিঠার মধ্যে মুখ্য হল 'হনঠাই'। সমতল কাছাড়ে বসবাসকারী ডিমাছাদের সংস্কৃতিতে বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাব

অনেকাংশেই লক্ষ করা যায়। তাই পিঠা-পুলিও তাদের খাদ্য তালিকায় সংযোজিত হয়েছে। পৌষ সংক্রান্তিতে চালের তৈরি বিভিন্ন ধরনের পিঠা বানানোর প্রচলন রয়েছে। হনঠাই (সেদ্ধপুলি), হনপের (মালপোয়া), হনপ্রু (পাটিসাপ্টা) মাইব্রেং (সেদ্ধ বিন্নিচালের পিঠা) ইত্যাদি ডিমাছাদের কাছে জনপ্রিয়।

(ঘ) লোকক্রীড়া :

খেলাধূলা অতিপ্রাচীনকাল থেকে চলে আসা এক সামাজিক ক্রিয়া। অবসর আনন্দদায়ক কাজের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করার বাসনা থেকেই ক্রীড়া বা খেলার উৎপত্তি।

> *"ক্রীড়া মানুষের জীবনের অনুকৃতি। জীবনসংগ্রামের, জীবনচর্চার বিষয়গুলিকে উপাদান হিসেবে নিয়ে কিছুটা ফ্যান্টাসী, কিছুটা অনাবিল আনন্দের সংমিশ্রনে প্রাচীনকাল থেকে মানুষ সৃষ্টি করে চলেছে নানা ধরণের খেলা। তাই মানুষের কৃষ্টি বা সংস্কৃতির একটি বিষয় খেলাধূলা বা ক্রীড়া এবং যেহেতু যুগ যুগ ধরে মানুষের জীবনচর্চার মধ্যে খেলাগুলি থেকে গেছে এবং সঞ্চারিত হয়েছে তাই প্রাচীন ক্রীড়া লোক- সংস্কৃতির অঙ্গীভূত, ফোকলোরের বিষয়।"*[৫]

বলা যায় লোকক্রীড়া মানুষের জীবনচর্চা থেকেই শুরু হয়েছে। লোকক্রীড়ার মধ্যে প্রাচীন মানুষের জীবনধারণ প্রণালীর ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ডিমাছারা খেলাকে বলে ‘মালাউঠাই’। ডিমাছা ছেলে বা মেয়েদের মধ্যে অনেক ধরণের খেলাই প্রচলিত। যেমন, সুঠাই মালাউবা (একধরণের বনজ গাছের বীজ দিয়ে খেলা), জঠাই মালাউবা (লাটিম খেলা), গনছা মালাউবা (কাঠি খেলা), রুমুন নেবা (শক্তির খেলা), হাড়ং বাইবা (ঝাপ দেওয়া খেলা), ডুয়ুং সূবা (দড়ি টানা খেলা), লংঠাই লেমবা (ঢিল ছোঁড়া খেলা) ইত্যাদি।

ডিমাছা সমাজে প্রচলিত এই সমস্ত খেলাকে শ্রেণিবিন্যস্ত করে উপস্থাপন করা যেতে পারে—

১. একব্যক্তি বা একক খেলা— সুঠাই মালাউবা,
হাটাই মালাউবা ,
গনছা মালাউবা

২. দ্বৈত বা দুইজনের খেলা— রুমুন নেলাইবা,
ডুয়ুং সিগলাইবা

৩. দলবদ্ধ খেলা— হাড়ং বাইবা
ইয়াওগ্লাও লেমবা
ছল জবা
ব.াজাবঠাই
ডাইলাইবা

৪. বালিকাদের খেলা— গনছা মালাউবা
সাটেমা মালাউবা
রিকনঠাইমা ডাওবা

৫. ছেলেদের খেলা— জঠাই মালাউবা

রুমুন নেবা
হাডং বাইবা
ডুয়ুং সিগলাইবা

(ঙ) লোকশিল্প ও প্রযুক্তি :

শিল্প ব্যবহারিক জীবন উপকরণ এবং পরিবেশের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। তাই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি জাতির ইতিহাস, জাতিতত্ত্ব এবং সংস্কৃতির নানা দিক। শিল্প ও প্রযুক্তি যে কোনো জাতির উৎকর্ষতার পরিচায়ক। কারণ মানুষ সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সময়ের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে উপলব্ধির মধ্য দিয়ে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এই অভিজ্ঞতালব্ধ সৃষ্টিই পরবর্তীতে একটি মার্জিত শিল্পে পরিণত হয়েছে। শিল্প তাই ব্যবহারিক জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়।

ডিমাছা লোকশিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে তাঁতবস্ত্র শিল্প, কাঠশিল্প, বাঁশের তৈরি হস্তশিল্প। তাঁতে বস্ত্র বুননের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রী ডিমাছারা নিজেরাই তৈরি করে। তাঁতের কাজে ব্যবহৃত সামগ্রী হল—

ঠুরী : বাঁশের তৈরি এই যন্ত্র তাঁতের কাজে ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রটির দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫ সে:মি:, প্রস্থ ২.৫ সে:মি:।

হালাই : এটি কাঠের তৈরি। যন্ত্রটির একটি অংশ হাতল হিসেবে ব্যবহৃত হয় আর অন্য অংশটিতে কয়েকটি ফুটো থাকে, যার মধ্য দিয়ে সূতো ভরা হয়। মূলত 'হালাই' ব্যবহার করা হয় সূতো দিয়ে নক্সা করার ক্ষেত্রে। সূতোকে সঠিক অবস্থানে রাখার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এক একটি সূতো হালাইয়ের এক একটি ছিদ্রের মধ্য দিয়ে পার করা হয়।

মাইডিক : এটি বাঁশের তৈরি পাত্র। 'মাইডি' অর্থ হল কাপড়ে কলপ করার পাত্র। অর্থাৎ সূতোয় কলপ করার জন্য ব্যবহৃত পাত্র। এটি বাঁশের চোঙ, সেখানে ময়দা বা ভাতের ফ্যানের কলপ রাখা হত। বর্তমানে এই পাত্র ব্যবহৃত হয় না।

বালাঙশি : এক ধরনের ঝাড়ু যা সূতোয় কলপ দেবার সময় ব্যবহৃত হয়। এই ঝাড়ু দিয়ে বাড়িতে বানানো কলপ সূতোয় প্রলেপ দেওয়া হয়। কলপের প্রলেপ দেওয়া সূতো রোদে শুকানোর পর তা কাপড় বোনার জন্য তৈরি হয়।

জেংথার : এই যন্ত্র তাঁতবোনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। এটি কাঠের তৈরি একটি ছাঁচ।

রাসি : তাঁত বোনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য যন্ত্র হল রাসি। এটি বাঁশের তৈরি। এই যন্ত্র তৈরি হয় দুটি বাঁশের বাট সমান্তরাল ভাবে রেখে এর ফাঁকা জায়গায় ছোট ছোট বাঁশের কাঠিগুলোকে পরপর গেঁথে দেওয়া হয়। যখন সূতোকে বুননের জন্য সাজানো হয় তখন সুতোকে এই রাসির শলাকার ফাঁকের মধ্যে দিয়ে পার করা হয়। এই রশি চিরুণীর মতো। এতে সূতো সঠিকভাবে বা সুচারুরূপে সাজানো থাকে।

তাঁত সরঞ্জাম ছাড়াও বিভিন্ন ব্যবহারিক বা দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত ডিমাছাদের হস্তশিল্পের পরিচায়ক হল—

জেম্বাই : এটি ডিমাছা সমাজে ব্যবহৃত বাঁশ কিংবা বেতের তৈরি ছোট ঝুরি। নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, ছোটোখাটো প্রয়োজনীয় সামগ্রী বহন করতে এই পাত্র ব্যবহার করা হত। তবে এটি ক্ষণস্থায়ী।

খাউজেব : এটি বাঁশ কিংবা বেতের তৈরি ছোট ঢাকনাযুক্ত পাত্র। একসময় এই খাউজে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী রাখার জন্য ব্যবহার করা হত। মেয়েদের গয়না, টাকাপয়সা, দরকারি সুতো রাখার জন্য এই পাত্র মেয়েদের কাছে খুবই প্রিয়।

লঙ্খাই : বাঁশের তৈরি বৃহৎ আকারের এই ঝুরি ভারি বস্তু বহন কাজে ব্যবহৃত হয়। এই ঝুরির সাথে বেতের তৈরি একটি ফিতা লাগানো থাকে। এই ফিতা পেছনের দিক থেকে টেনে কপালে আটকে বহন করা হয়। পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী ডিমাছাদের কাছে এই ঝুরি অপরিহার্য। পার্বত্য অঞ্চলের উঁচু নীচু জায়গায় ভারি বস্তু বহন করার ক্ষেত্রে এটি খুবই সুবিধাজনক।

খাইলিম : ডিমাছা সমাজে ব্যবহৃত এই বৃহৎ ঝুরি চারটি উপকরণ দিয়ে তৈরি। বাঁশ, কাঠ, একধরনের বনজ পতা 'লাইরু' এবং বেত। ঝুরির বাইরের ছাঁচ তৈরি হয় বেত দিয়ে, বনজ পাতা 'লাইরু'কে ভেতরে এমনভাবে পাতা হয় যাতে ভেতরে জল ঢুকতে না পারে এবং কোনো পোকা-মাকড় যাতে ঢুকতে না পারে। এই 'খাইলিম'এর ছাঁচটি বাঁশের চারটি পায়ার ওপর দাঁড় করানো হয়। এর সাথে বেতের ফিতা বাঁধা থাকে। দরকারি জিনিষপত্র, কাপড়, অলঙ্কার রাখার জন্য খাইলিম ব্যবহার করা হয়।

ইয়ামসা : ডিমাছা ভাষায় 'ইয়াম' অর্থ চাটাই বা পাটি।, 'সা' অর্থ ছোট। ডিমাছা হস্তশিল্পের এক নিদর্শন হল এই পাটিশিল্প। এই চাটাই বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। বাঁশের তৈরি এই চাটাই তিন ধরনের হয়। যেমন—

১. ইয়াম ফ্লেঙ : এটি ধান, শস্য ইত্যাদি শুকানোর কাজে ব্যবহৃত

হয়।

২. ইয়মসা অথবা ইয়ামলাবুমিন : এই চাটাইয়ে বিভিন্নরকম নক্সা করা হয় এবং এটি বিশেষ কোন অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হয়।

৩. ইয়ামঠাই : এই চাটাই বিছানার মাদুর হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

৪. খামপ্লু : একধরনের বড় ঝুরি যা ডিমাছাদের রোজদিনকার কাজে ব্যবহৃত হয়। এটি বাঁশ এবং বেতের তৈরি। খামপ্লু চাল-ডাল-শস্য রাখার পাত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া ডিমাছাদের যে কোনো লোকাচারে এই পাত্র অপরিহার্য।

৫. মরী : বাঁশের তৈরি বৃহৎ এই পাত্র ধান রাখার পাত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গোল আকৃতির এই পাত্রটি প্রত্যেক ডিমাছা কৃষক পরিবারে দেখা যায়।

৬. সামঠো-রিমিন : কাঠের তৈরি হামান-দিস্তা। ডিমাছাদের জীবনের এর গুরুত্ব আজও রয়েছে। ধান থেকে শুরু করে বিভিন্ন শস্যাদির খোসা ছাড়াতে এই হামানদিস্তা ব্যবহার করা হয়।

৭. ঠুলিপং / ঠাউসেবয়াবা : ডিমাছা সমাজের এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রযুক্তি হল ঠুলিপং। এটি শস্য থেকে তেল নিষ্কাষনের যন্ত্র। বর্তমান সময়ে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সময়ে এইসব যন্ত্রের দেখা পাওয়া দুষ্কর তবে একসময় এই যন্ত্রের মাধ্যমেই ডিমাছারা শস্য থেকে তেল নিষ্কাষণের কাজ সম্পন্ন করত, যা ডিমাছা প্রযুক্তির এক স্বতন্ত্র্য পরিচায়ক।

তথ্যসূত্র :

১. **Cultural Anthropology / Introduction Wikibooks.**

২. **'The Dimasa Child of the Big River', Vivekananda Kendra Institute of Culture, Uzanbazar, Guwahati, 2003,** পৃঃ ২৫

৩. থাওসেন, যতীন্দ্রলাল, 'গ্রাউ ডিমাজাঙ ঃ রবীন্দ্র নজরুল' নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, হাফলং, আসাম, পৃ: 'ভূমিকা'

৪. নাথ, তুষারকান্তি, 'ডিমাছা সংস্কৃতির আভাস' গ্রন্থে অনুপমা নাইডিঙের উদ্ধৃতি, পৃঃ ৫৭

৫. **Sen, Gouri, 'Life in Kachari Kingdom at Khaspur', Partha Datta, Vivekananda Road, Silchar, 2003,** পৃঃ ৫৮

৬. চক্রবর্তী, বরুণকুমার সম্পাদিত, 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ' গ্রন্থে ড০ অলোককুমার ব্যানার্জীর উদ্ধৃতি, অপর্ণা বুক ডিসট্রিবিউটারস, কলকাতা, ২০০৭, পৃঃ ৪৯৭